সঞ্জীব চৌধুরী

এতো সহজেই চলে যাওয়া শিখেছে মানুষ

(২৫ ডিসেম্বর ১৯৬২ থেকে ১৯ নবেম্বর ২০০৭)

আহসান কবির

হয়তো সহজ কাছে আসা
তাই কাছে আসি
হয়তো সহজ ভালোবাসা
তাই ভালোবাসি
যখন সহজে কিছু পাই
ভাবি, হয়তো সহজ ছিল পাওয়া
যখন হারাই, ভাবি হায়
এতো সহজেই চলে যাওয়া শিখেছে মানুষ!

-নির্মলেন্দু গুণ

খুব সহজেই চলে যাবার বিপক্ষে ছিলেন তিনি। কখনো সখনো দীর্ঘশ্বাস ফেলে অরুণাভ সরকারের সেই লাইনটা বলতেন- 'শুধু একবার চলে গেলে নারীরা ফেরে না!' তাহলে পুরুষরা কি ফিরে আসে? সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধ কি ফিরেছিলেন সংসারে?

পৃথিবীর সমান আয়োজন দিয়েও তাকে আর ফেরানো যাবে না। তো কোথায় গেলেন তিনি? 'রুদ্র'মেলার এক আয়োজনে তিনি বলেছিলেন, মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় রুদ্রের (রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ) কাছে যাই।

তাহলে কি তিনি রুদ্রের কাছেই গিয়েছেন? যদি তাই হয়, চোখের জলের আলপনায় তাকে চিঠি লেখা যাবে। অন্তর বাজিয়ে গান ধরা যাবে, 'ভালো আছি, ভালো থেকো। আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো।'

চলে যাবার আগে তার হাত ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিলাম। মনে হলো

আগুনের কথা বন্ধুকে বলি, দু' হাতে আগুন তারো! কারো মালা থেকে খসে পড়া ফুল, রক্তের চেয়ে গাঢ়।

তার হাত ছুঁয়ে এই বুকে আগুন নিয়ে ফির-লাম। আগুনের নাম 'সঞ্জীব চৌধুরী'!

নো মোর রেজিমেন্টেশান

সঞ্জীব চৌধুরীর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল টিএসসিতে। রুদ্রদা তখনো বেঁচে আছেন। দুজনারই বড় চুল। আর আমি চুল বড় রাখার চেষ্টা করছি। আমার কলেজ আর 'বাহিনী'র জীবন সম্পর্কে জেনে বলেছিলেন 'নো মোর রেজিমেন্টেশান'! পরিচয়ের কিছুদিন পর একবার বলেছিলেন, ভালোবাসাও মাঝে মাঝে রেজিমেন্টেশানের মধ্যে যেতে ভালোবাসে। এইটার নাম বিবাহ!

রেজিমেন্টেড সোসাইটির একজন মানুষ সম্পর্কে তিনি খুবই বড় ধারণা পোষণ করতেন। তার নাম 'কর্নেল তাহের'। বলতেন, চিন্তা করে দেখ। একজন মানুষ যিনি মুক্তিযুদ্ধে একটি পা হারিয়েছিলেন। ১৯৭৫-এর নবেম্বরে একজন জেনারেলের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। সেই জেনারেলের শাসনামলে তাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। একজন মানুষ ফাঁসির দিন সকালে শেভ করছেন। চা খাচ্ছেন। জেলারসহ অন্যদের খাওয়ার অনুরোধ করছেন। জেলের 'হুজুর' আসার পর বলছেন, আমি কোনো অন্যায় করিনি। তাই তওবা কেন করব? চিঠিতে প্রিয়তমা স্ত্রী লুৎফাকে লিখছেন, নীতু (মেয়ে), মিশু আর যিশুর জন্য আমি কিছুই রেখে যেতে পারিনি। আসলে নিঃশঙ্কচিত্তের চেয়ে বড় কোনো সম্পদ থাকতে পারে না। এই নিঃশঙ্কচিত্ত নিয়েই ক্র্যাচে ভর করে মানুষটা ফাঁসির মঞ্চে একা একা এগিয়ে গিয়েছিলেন। নিজ হাতে পরেছিলেন ফাঁসির দড়ি। এর চেয়ে সাহসের আর কী হতে পারে? এর চেয়ে বেদনার আর কী হতে পারে? এই ঘটনা বলার পর ধরা গলায় সঞ্জীব চৌধুরীকে কাঁদতে দেখেছি।

সঞ্জীব চৌধুরীর একটি মাত্র সলো ক্যাসেট বেরিয়েছিল। কর্নেল তাহেরকে নিয়ে একটা গান আছে সেখানে- আমি স্বপ্নেরই কথা বলতে চাই! আমি হৃদয়ের কথা বলতে চাই! আমি জীবনের কথা বলতে চাই!

জীবনের কথা গানে গানে শুনব বলে সঞ্জীব চৌধুরীকে বেশি কিছুদিন এই গ্রহে থাকতে বলেছিলাম। উনি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাছে যাবেন। উনি আবুল হাসানের কাছে যেয়ে বলবেন- আমি সঞ্জীব। সেই এক পাথর আছে কেবলই লাবন্য ধরে অথবা যেখানেই যাই রাত হয়ে যাই। উনি রুদ্রদার কাছে যাবেন!

এদের মতো অল্প বয়সেই সঞ্জীব চলে গেলেন। সুমন চ্যাটার্জির গানে আছে- সঞ্জীব পুরোহিত হাঁটলেন! ১৫ নবেম্বর বৃহস্পতিবার, ২০০৭। মধ্যরাত। সারা বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সিডর। আর এই ঝড় বয়ে যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে। তিনি বমি করছেন। পানিশূন্য হয়ে যাচ্ছে শরীর। শেষ রাতের দিকে স্ট্রোক। বাইরে ঝড়, বিদ্যুৎ নেই। মোবাইলে চার্জ নেই। হাসপাতালে নেবার মতো কেউ নেই। সঞ্জীব পুরোহিতের মতো তার যে যাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছিল, আমরা কেউ বুঝতে পারিনি!

'দলছুট' হয়ে জোসনা বিহার!

রাতকে বলি চোখ বুঁজে তুই থাক
যে আসে যায় চমকে সে না যাক
রাতকে বলি রাতে আসে কে?
সাবধানী চোখ রাখতে বলি যে
অনেক দিনের অনেক পরিচয়ে
আধফোটা ঘুম আধেক জাগা নিয়ে!
চোখ খুলে দেখি কেউ নেই, কেউ নেই।
ধরতে গিয়ে হেরে গেছি, দেখতে গিয়ে থেমে গেছি
হাত বাড়ালে নেই কেউ নেই, একা নিজেই!

-জোসনা বিহার (সঞ্জীব চৌধুরী)

উনিশ নবেম্বর। রাত বারোটা দশ। একা একা নিজেই জোসনা নিতে চলে যাচ্ছেন সঞ্জীব চৌধুরী। চীৎকার করে কাঁদছে তার স্ত্রী শিল্পী। তার মেয়ে কিংবদন্তি, বাপ্পা মজুমদার, আবেদা নাসরিন কলি। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে রাসেল ও নীল। ডাকছে- দাদা, চোখ খোলেন দাদা...

গানে লিখে গিয়েছেন- চোখ খুলে দেখি কেউ নেই। সবাই আছে তাই তিনি চোখ খুললেন না। হায় স্বার্থপরের মতো মানুষটা দলছুট হয়ে একা একা জোসনা বিহারে চলে গেলেন!

ছুঁয়ে কান্নার রং...

নিউটন আজীবন আপেল গাছের নিচে বসে থাকবেন। বুঝলি? সঞ্জীব চৌধুরীর এই প্রশ্নের

উত্তরে আমি বলতাম, 'বুঝলাম'। এরপর বলতেন- আপেল মাটিতে পড়লে সেটার দায়দায়িত্ব পুলিশের। আর পানিতে পড়লে? আমি বলতাম- দায়িত্ব নৌবাহিনীর। তারপর ছিল সঞ্জীবের প্রাণ নিংড়ানো আকুতি-বুঝলি নৌবাহিনীর লোকেরা নদী ভালো বোঝে। নৌকা ভালো বোঝে। তুই ঐ জীবনে কিছুদিন ছিলি বলে তুইও ভালো বুঝবি!! আমি বুড়িগঙ্গা ব্রীজের নিচে যাব। হাতে তালি দিয়ে বলব কে আছিস? তুই এসে হাজির হবি। কুর্নিশ করে বলবি, 'নৌকা তৈয়ার সম্রাট'! আমি তাকে নিয়ে নৌকা বিহারে যাব! আমার সঙ্গে কে আছে দেখতে চাইবি না। বল প্রমিজ!

আমি বহুদিন নৌকা ভাড়া করে দিয়েছি। তিনি একজনকে নিয়ে নৌকা বিহারে গিয়েছেন। পাশের মানুষটা টেরও পাননি। তাকে নিয়ে সফলতার সব দরোজায় তিনি কড়া নেড়েছেন। উন্নতির অনেক সিড়ির কাছে নিয়ে এসে বলেছেন- শুরু হোক যাত্রা। শুভ হোক যাত্রা। যাত্রা শুরুর পর সে কোথায় গিয়েছে আজ সে কথা থাক। বহুগুণ বেশি দুঃখ পাবার পর সেগুলো তিনি পাঁজর খুলে খুলে নিজ বুকে জমা রাখতেন। কান্নাটা পরিণত করতেন গানে। কাঁদতে কাঁদতে একবার লিখলেন-

আমি তোমাকেই বলে দেব/কি যে একা দীর্ঘ রাত/আমি হেঁটে গেছি বিরান পথে/ ছুঁয়ে কান্নার রং...

এক জীবনে এই বিরান পথে সঞ্জীবের পথ হাঁটা বুঝি থামল না...

পার্বতীর সাথে দেখা হলে কী বলবো সঞ্জীব দা?

সহজেই চলে যাওয়া

মাঝরাতে যখন তিনি বাসায় ফিরতেন, বহুদিন তাকে বাসায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ছিল আমার। পান্থপথে একদিন ট্রাক থামিয়ে ঘুষ নিচ্ছিল পুলিশ। তিনি লাফ দিয়ে নেমে পুলিশের কলার চেপে ধরলেন। সে এক দৃশ্য। এরপর আরো পুলিশ, অতঃপর থানা, সর্বশেষ ঘটনা গান। তিনি ওসির রুমে গান ধরলেন 'সাদা ময়লা রঙিলা পালে, আউলা বাতাস খেলে...,

মাত্র গান গেয়ে যেতে চান।

গানটার সুর করল জিয়াউদ্দিন তমাল (বর্তমানে নগর বাউলের কি বোর্ডিস্ট) 'কুল এক্সপোজার' পি আর ও ইভেন্ট হাউসের এরশাদুল হক টিংকুর সৌজন্য 'সাত রঙা সাতজন' নামে জি সিরিজ থেকে ক্যাসেট বেরও হয়েছিল। গানের প্রথম কয়েকটি লাইন ছিল এমন-

দুঃখ ব্যথায় মুখটা যে নীল
তোমার আমার না হলো মিল (এই লাইনটা সঞ্জীব চৌধুরীর দেয়া)
নীল দুঃখের সেই মেয়েটা পরের পরিণীতা।
বুকের ভেতর জ্বলে ধুধু, ভালোবাসার চিতা।

ঢাকা মেডিকেলের শিক্ষার্থীরা যারা তার পাঁজর খুলে হৃদয় খুঁড়ে দেখবে, তারা যেন কাউকে কিছু না বলে। পার্বতীর জন্য তারা যেন একটুও না কাঁদে। শিল্পী আর কিংবদন্তির জন্য তারা যেন প্রার্থনা করে। যারা বিপ্লব আর প্রেমের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে চায়, তারা যদি কেউ সময় পায় তাহলে তারা যেন মিলনের সমাধি হয়ে সামান্য দূরে সঞ্জীবকেও একটু দেখে আসে

একালের দেবদাস

পাঁচতারা হোটেলে এলে তিনি খুব অস্বস্তি বোধ করতেন। বলতেন 'জুতো' পরতে ভালো লাগে না রে! জুতো না পরলে হোটেলের নিরাপত্তা রক্ষীরা কেমন করে যেন তাকায়। এ জন্য গান গাওয়া ভালো। গায়কেরা অনেক কিছু থেকে মাফ পায় রে!

১৬ নবেম্বর, ২০০৭। শুক্রবার। 'আল হেলাল' থেকে অ্যাপোলো হাসপাতালে নিয়ে যাবার পরে সঞ্জীবের 'পাঁচতারা' তত্ত্বটা মনে পড়ল। সাজানো-গোছানো ছবির মতো হাসপাতাল। ১৭ নবেম্বর ছুটে এল অনেকেই। কেউ কেউ তার সর্বশেষ অবস্থা জানতে চাইল। তার অবস্থা দেখা গেল কম্পিউটার স্ক্রিনে। তার বুক আর মস্তিষ্কের সর্বশেষ অবস্থা দেখিয়ে দিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এই একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। শরৎচন্দ্র বেঁচে থাকলে লিখতেন- একালের দেবদাস পার্বতীর বাড়ির দরজায় যেয়ে মরে না। আধুনিক হাসপাতালের কম্পিউটার স্ক্রিনে বুকের পাঁজর আর মাথার ছবির স্মৃতিটাও রেখে যায়।

আমি কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখা একালের দেবদাসকে দেখলাম। তাকে খুব জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল-

বেশি ভালোবেসেছিল দেবদাস কে তোমায়?/নাকি তুমি বোঝো না প্রেম, করো প্রেমের অভিনয়?/... ভালোবাসা বেশি হলে খুন হয়ে যেতে হয়/ দেবদাস বড় খুনী নিজ খুনে মেতে রয়...

আরেক দিন। রিকশা করে শাহবাগ পার হচ্ছি। পেছন ফিরে দুবার তাকে দেখল রিকশাওয়ালা। এরপর নিশ্চিত হয়ে সে গান ধরল- গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে... খুব রাগলেন তিনি। রিকশা থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলেন।

ফ্যান্টাসি কিংডমে অনুষ্ঠান হচ্ছে। গান ধরার আগে তিনি বললেন, আমি শাহ আব্দুল করিমের গান গাই। এই বাংলাদেশের ক্ষণজন্মা শিল্পী ও গীতিকারদের মধ্যে তিনি একজন। অসুস্থ এই মানুষটার জন্য আপনারা যে যেভাবে পারেন সাহায্য করেন।

হায় রে নিয়তি। শাহ আব্দুল করিম বেঁচে থাকলেন, বেঁচে থাকুন হাজারো বছর, কিন্তু সঞ্জীব চৌধুরী? আসলেই। খুব সহজেই চলে যাওয়া শিখেছে মানুষ!!!

বুকের ভেতর জ্বলে ধুধু...

কথা ছিল তিনি আমার একটি মাত্র গান গাইবেন। মাত্র একটি। খুব সহজিয়া হতে হবে সেটি। গানের প্রয়োজনে সেটা সস্তাও হতে পারে। আমি আমার বই, গানের ডায়েরি তাকে দেই। তার ভালো লাগে না। অতঃপর একটা ছড়া মনে ধরল তার।

দুঃখ ব্যথায় মুখটা তোমার নীল/ মনটা তোমার দূর আকাশের চিল।

এটাকে আরো সহজিয়া করে দিতে বললেন। নিজের সলো, দলছুটের কোন অ্যালবামের বাইরে আমার জন্য তিনি একটি

সব আয়োজন আর দুঃখের চন্দন কাঠ ছিল তৈরি। ছিল চোখের জল নামের পেট্রল। ছিল নিজেকে ধ্বংস করার আগুন। এভাবেই ভালোবাসার চিতায় তাকে উঠানোর জন্য প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম। দুপুরে তার লাশ রাখা হয়েছিল টিএসসিতে। সেখানে যেয়ে জানলাম তার শরীরটা ঢাকা মেডিকেলে দান করা হয়েছে। ১৯৬২ সালের 'বড় দিনে' অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর যে মানুষটি জন্মেছিলেন, তিনি চলে গেলেন ১৯ নবেম্বর, মধ্যরাতে। সবশেষে 'দলছুট' হয়ে তাকে একা একা জোসনা বিহারের দিকে হেঁটে যেতে দেখা গিয়েছিল।

ঢাকা মেডিকেলের শিক্ষার্থীরা যারা তার পাঁজর খুলে হৃদয় খুঁড়ে দেখবে, তারা যেন কাউকে কিছু না বলে। পার্বতীর জন্য তারা যেন একটুও না কাঁদে। শিল্পী আর কিংবদন্তির জন্য তারা যেন প্রার্থনা করে।

আর ডা. মিলনের মতো, যারা বিপ্লব আর প্রেমের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে চায়, তারা যদি কেউ সময় পায় তাহলে তারা যেন মিলনের সমাধি হয়ে সামান্য দূরে সঞ্জীবকেও একটু দেখে আসে। আঙুলে করে যেন নিয়ে আসে একটু আগুন!!

সবাই আসলে দু' হাতে আগুন নিয়ে জন্মায় না।

আগুন ধার দিতে পারে কয়জনা?

বুকের ভেতরে আগুন পুষতে পারে কয়জন?

kmunad02@yahoo.com